22140021

International Baccalaureate®
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

BENGALI A: LITERATURE – HIGHER LEVEL – PAPER 1
BENGALI A : LITTÉRATURE – NIVEAU SUPÉRIEUR – ÉPREUVE 1
BENGALÍ A: LITERATURA – NIVEL SUPERIOR – PRUEBA 1

Friday 9 May 2014 (morning)
Vendredi 9 mai 2014 (matin)
Viernes 9 de mayo de 2014 (mañana)

2 hours / 2 heures / 2 horas

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a literary commentary on one passage only.
- The maximum mark for this examination paper is *[20 marks]*.

INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

- N'ouvrez pas cette épreuve avant d'y être autorisé(e).
- Rédigez un commentaire littéraire sur un seul des passages.
- Le nombre maximum de points pour cette épreuve d'examen est *[20 points]*.

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un comentario literario sobre un solo pasaje.
- La puntuación máxima para esta prueba de examen es *[20 puntos]*.

© International Baccalaureate Organization 2014

*নিচে দেওয়া দুটি রচনার মধ্যে যেকোন **একটিই** বেছে নিয়ে তার সম্বন্ধে সাহিত্যিক আলোচনা কর:*

1.

শেষ পর্যন্ত যা মিস্টার এম. –কে বোরাকের কাহিনী বাদেও আর বলা হয়ে ওঠে নি, সে এক ভয়ানক কল্পজগতের কথা। আমি পাথর আর জলের কাছে গেলে কল্পলোকে বিচরণ করি। কিন্তু আমার নিজস্ব অনুভবে, চেতনায়, চর্চায় এ বাস্তব। আমি পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমে ক্রমে যখন হিমালয় স্পর্শ করি, এবং সেখানকার জগত নিয়ে আমার ভেতর একটা প্রেক্ষিত তৈরি হয়, ঘটনা তৈরি হয়, এ আমার কিছুতেই কল্পনার বিষয় নয়। আমি তাতে ভয়ানকভাবে জাগতিক উপস্থিত হই। মানুষ যখন ভাবনার মধ্যে দিয়ে পথ হাঁটে, কত কিছুই তো সে ভাবে, তার পাশে বসে থাকা লোকটিও কি সেই ভাবনার শব্দ শুনতে পায়? সেই ভাবনা কি শুধুই তার জাগতিক জীবনকে কেন্দ্রীভূত করে আবর্তিত হয়? কিন্তু তার ভাবনাটা তার কাছে, বাস্তব, সত্য, তা শত অলৌকিকতায় পূর্ণ হলেও। কেউ নিজেই এই অলৌকিকতাকে নিছক ভাবনা বলে উড়িয়ে দিতে পারে, বেশির ভাগ লোকই তাই করে, আমি সেই দলের নই।

সেদিন চারুকলায় শীতকাল।

বিকেলের বাতাসে নিঃসীম রৌদ্রের ধ্বনি। আমি একবার সেই পুরুষকে, একবার অচেনা জয়নুলকে দেখতে দেখতে হাঁটি। কত যে হাঁটি... সেই প্রাচীনকালের মানুষদের মতো, যারা হাজার রাত হাজার দিন পায়ে হেঁটে হাজার পথ পাড়ি দিত।

দূরবর্তী চুড়োপাহাড়ে পা রেখে তালের শাঁসের মতো ঝকঝকে ভোরে ঠিরঠির শীতে ফলশা পাতার মতো কাঁপতে থাকি। ওপরে পৃথিবীর মতো বিশাল আসমান। সামনে হিমালয়ের দুই স্তনের ভাঁজ গলিয়ে টকটকে শাদা সূর্যটা উঠবে, তারই মৃদু মৃদু আভায় ওপরের মেঘপুঞ্জে ছুটোছুটি লেগেছে। হায়! এত বড় পাহাড়ের চুড়োয় আমি একা, প্রকাণ্ড বরফ স্তূপের ওপর দিয়ে ঘাই দিয়ে উঠতে থাকা সূর্যটাকে আমি কী করে একা সামলাই! তার রূপের ঝাপটে ধাক্কা খেয়ে আমি পাহাড়ের ঘাসে মাটিতে ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে যদি পাতালে তলিয়ে যাই? নিজেকে খামচে এই মহা পৃথিবীর অপার রহস্যের সূত্র কোথায় এই খুঁজছি আর দেখছি, সূর্যের মাঢ়ি দাঁত উঁকি দিল দিল, কাণ্ডটা এখানে থেমে থাকলে কথা ছিল, কে বলেছিল— ঈশ্বরকে নৈঃসঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায়, আর উপভোগ করা যায় যৌথতার মধ্যে। নিজের মধ্যে তন্ন তন্ন খুঁজে মনে পড়ে ব্রহ্মপুত্রের ওপর সার সার পাখির বিস্তার দেখে আমারই মধ্যে এই বোধ জন্মেছিল। আমি যখন মহাশক্তির অপার সৌন্দর্যে কম্পিত, বিস্মিত, ভীত... তখনই অপরপাশে চোখে পড়ে। কেন কাঞ্চনজঙ্ঘা ঠিক সূর্যদয়ের বিপরীতেই তার স্থান করে নিয়েছে? যখন সূর্যের টিপটিপ চোখ বাড়াচ্ছে তখন সে নিজে যত না সুন্দর তার চেয়েও অকল্পনীয় রূপ রস বহু বর্ণে অপার্থিব করে তুলছে অপর পার্শ্বের হিমালয়ের চুড়োর বরফখণ্ডের সারি সারি হাঁস বলাকাকে। সেই বরফ স্তূপকে আমার মনে হচ্ছে, এক্ষণি সৌন্দর্যের চাপে অস্থির হয়ে আকাশপথে উড়াল দেবে। আমি দেখি বিকটাকার ফালি ফালি তরমুজ তার রক্ত দিয়ে নিজেকে নয়, অপর পার্শ্বের কাঞ্চনজঙ্ঘাকে এমন অপূর্ব আলোয় উদ্ভাসিত করেছে, মেঘপুঞ্জগুলো এমন মুক্তোর মালায় ছুটতে শুরু করেছে, বেঁচে আছি কি মরে কী মরে গেছি, ঠাহর করতে পারি না।

আপনি হয় সূর্যোদয় দেখুন, নয় কাঞ্চনজঙ্ঘা, বলতে বলতে আমার পাশে এসে দাঁড়ায় জয়নুলের সামনে দাঁড়ানো অতীন। আপনি সূর্যোদয় দেখছেন, সাথে সাথে মাথা ঘুরে যাচ্ছে আপনার অপর পাশের কাঞ্চনজঙ্ঘায়... একই সাথে নৈঃসঙ্গ... এবং যৌথতা উপভোগ করার এই আকুল চেষ্টা কেন করছেন বলুন তো?

আমি হতচকিত, ওর দিকে তাকাই।

যেহেতু সে সূর্যোদয় দেখতে দেখতে কথা বলছে, কাঞ্চনজঙ্ঘার লোভ সামলে আমিও সেই ধেয়ে উঠতে থাকা রক্তকণিকার দিকে চেয়ে থাকি।

অতীন বলে, আপনি একটা বিষয় লক্ষ করেছেন কি–না জানি না, বহু লোকই খুব ঘটা করে প্রকৃতি দেখতে আসে, কিন্তু হাতে একদমই সময় নিয়ে আসে না। একটা জায়গায় এসে হুড়োহুড়ি করে তারা সেই জায়গাটার সবগুলো স্থান দেখে ফেলতে চায়। আমাকে যেটা সব চাইতে বিরক্ত করে, তারা ক্যামেরা নিয়ে আসে, এবং সেই জায়গাটা দেখার লোভকে পায়ে মাড়িয়ে সেখানে নিজেদের ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমি বলছি না, তারা ছবি তুলবে না, মানুষই স্মৃতির মধ্যে তার দেখা সেরা জায়গাগুলো সঞ্চিত রাখতে চায়। কিন্তু ধরুন, আপনি হাতে কিছু সময় নিয়ে এলেই কিন্তু আপনার ভ্রমণের সমস্ত প্রাপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে পারেন... এত আলোকছটায় সূর্য উঠছে, আর আমি কথা বলে আপনার উপভোগ মাটি করছি, বুঝলেন, আমি যদি দেখতাম, আপনি হয় সূর্যোদয় নয় কাঞ্চনজঙ্ঘা দুটোর একটির মধ্যে গভীর ধ্যানে গেঁথে গেছেন, তবে আমার কথার সাধ্য ছিল না, আপনার কানে প্রবেশ করার। আমি বেশ ক'দিন এখানে এসেছি... বলা যায় তিন চার বার। ছবি তোলা তো পরের কথা, আমি রীতিমতো বাকরুদ্ধ হয়ে থেকেছি। একদিন আমার পেছনে একজন সূর্যটাকে দেখে এমন লাফ দিল, যেন সে খপ্ করে ওটাকে মুঠোয় ভরে ফেলবে। আমি রীতিমতো ছিটকে পাহাড়ের একপ্রান্তে পড়েও ঠাহর করতে পারি নি, আমি আদৌ ছিটকে পড়েছি, এমনই সূর্যধ্যান আমাকে পেয়ে বসেছিল... বুঝলেন, আজ আপনার প্রকৃতি দর্শনের বারোটা বাজিয়ে দিলাম, আপনি কাল আবার এসে নতুন করে শুরু করুন। আপনার চোখে আমি প্রকৃতির ধ্যান দেখতে পেয়েছি, আপনি কেন অন্যদের মতো আচরণ করবেন? ওফ্ আপনার নামই তো জানা হলো না।

নাসরীন জাহান, *স্বর্গলোকের ঘোড়া* (২০০০)

2.

পূর্বমেঘ

মেঘ হে, শেষ জ্যৈষ্ঠ–প্রহরে তোমাকে ডাকি মেলে শূন্য হাত;
এসো হে, ঝরে যাও ফসলহীন এই শুকনো মাঠ জুড়ে অবিশ্রাম;
সান্ত্বনা দূরাহত, তোমাকে দেখে তাই জুড়াবে হয়তো বা তপ্তদিন;
একটু ঝরে যাও, দগ্ধ দুপুরের আঠালো পিচগলা কলকাতায়। […]

অফিস বাবুরা ভিড়ের চাপে পেষা একটু হাঁফ ছেড়ে নিজের মনে,
স্বস্তি যদি বা খুঁজেও নিতে চায়, তবুও থাকে কিছু দুর্ভাবনা;
ঘরের টানে ছোটা ব্যস্ত পা জোড়া একটু বুঝি বা থমকে যায়,
কাদা কি জলে ডুবে, অথবা বাজারের ক্লিন্ন দিনগত জঞ্জালে।

হঠাৎ ছুটি–পাওয়া মজার দুপুরে, গলিতে জমলেও নোংরা জল–
সেখানে ভাসিয়ে কাগজী নৌকা যে শিশু খুঁজে নেয় রূপকথা,
আজও সে জানেনা কী তার ভাগ্য, শুধুই চিন্তাহীন ভালোলাগা
পারবে তাকে দিতে, অথবা ফুটপাথের ন্যাংটো অমৃতের পুত্রকে–

অবাক দুটি তার ডাগর চোখ মেলে দেখেছে যে শ্যাম মেঘমালা,
স্নিগ্ধ ধারা দিয়ে অল্প ভেজাবে পোষাকহীন তার আদুল গা;
তবুও ত্রস্ত আঁচলে টানবে জননী তাকে দ্রুত কোলের মাঝে–
অসুখ সে তো এক বিলাস মাত্র এ দুঃস্থ জীবনের যন্ত্রনায়।

ছাঁটাই রুখতে জরুরী জমায়েৎ আর ছড়িয়ে দিতে গিয়ে ইস্তেহার,
এ শেড্ থেকে ঘুরে অন্য শেডে যেতে, বৃষ্টি এসে গেলে আড়াল চেয়ে
একটু দাঁড়াতে, লেবার অফ্সারের বাংলো থেকে আসা মেজাজী গানে
জঙ্গি মজুরের কেন যে মনে পড়ে দেখেনি কতদিন যুবতী বউকে।

ঘরের দিকে সে শিথিল পায়ে ফেরে অজানা ব্যথা কোন বুকের নিচে;
লড়াকু সাথী ছাড়া কেউ তো বসে নেই সেখানে তার তরে অপেক্ষায়;
শূন্য ঘরটিতে একলা বসে তার ভাবনা জাগে মনে দুর্নিবার,
এবারে ঝড়ে কি উড়িয়ে নেবে ঠিক পুরনো খড়–গোঁজা ঘরের চাল;

তবুও চাইছে বৃষ্টি আজ তার তাপিত প্রাণ এ পরবাসে,
মেঘের ডানা যদি উড়িয়ে নেয় এই দীর্ঘ বিরহের যত জ্বালা;
দেহাতি কোন গাঁয়ে কাঁকর মাটি থেকে ফুটি কি তরমুজ হাতে নিয়ে
ফেরার পথে জল আলতো ছোঁয়া দিলে বধূও পাবে কি পরশ তার!

মেঘ তো দক্ষিণ সাগর থেকে আনো নিবিড় জলধারা বয়ে;
তাতেও মোছেনা মেশিন–ঘোরানো এ রুক্ষ দু'হাতের কঠিনতা;
বৃষ্টি–ভেজা হাওয়া স্মৃতিকে টানে, সে মিটিং–এ হেঁকে ওঠে–হরতাল
মাথার উপরে সারাটি দিন জ্বলা তীব্র আঁচ থেকে রেহাই পেয়ে;

যদিও বস্তির উঠান ছাপিয়ে উঠবে নর্দমার গলিতে পাঁক,
তবুও তোমাকে দু'হাত তুলে ডাকে টিনের চালের নিচে মানুষেরা; [...]
[...] কৃষ্ণচুড়া এই শহরে বয়ে আনে রক্তরাঙানো সে দিনের স্মৃতি,
মুছোনা তাকে তুমি বরং দিয়ে যাও দগ্ধ বকুলের পুনর্বাস।

এবারে বয়ে যাও ঘোলানো কাদা আর স্রোত-বিহীন ঐ নদীকে ছুঁয়ে;
গ্রামের শেষে মাঠে বুড়োরা গল্প করে পঞ্চাশের সেই মন্বন্তর,
আর যে বন্যা দু'সন আগে খুব ভাসিয়েছিল সারা মহকুমা;
তবুও তোমাকে ছাড়া তো আর কিছু জানেনা ঋণে-ডোবা বর্গাদার।

সব্যসাচী দেব, *স্তব্ধ স্মৃতি বহমান স্রোত* (১৯৮৫)